

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চিত্তরঞ্জন ও নজরুল : নজরুলের একটি কবিতার অগ্রন্থিত অংশ

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.2
Pages	১৫-২৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চিত্তরঞ্জন ও নজরুল : নজরুলের একটি কবিতার অগ্রন্থিত অংশ

সৌমিত্র শেখর*

সার-সংক্ষেপ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব; মহাত্মা। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণে উষ্ণ। তাঁরা মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর অর্জন করেছেন পরস্পরের সান্নিধ্য। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে সমীহ করেছেন; প্রভাবিত করেছেন; প্রভাবিত হয়েছেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা; প্রত্যাশা ছিল বাঙালির জন্য শোষণমুক্ত দেশ গড়ার। দুজনের বয়সে পার্থক্য প্রায় ত্রিশ বছর – কিন্তু প্রত্যাশার কোনো পার্থক্য ছিল না তাঁদের। চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল প্রয়াণের পর নজরুল অনুরুদ্ধ অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিত্তরঞ্জন-স্মরণে যে পাঁচটি কবিতা রচনা করেছেন সেগুলোতে নজরুল-চিত্তের গভীরতর আবেগ ও শ্রদ্ধার প্রতিফলন রয়েছে। প্রয়াত চিত্তরঞ্জনের প্রতি অনিরুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমাবেগে নজরুল 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় এমন কিছু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যেগুলো মুসলিম ভাবধারার অনুকূল নয় বলে মত দিয়েছিলেন কয়েকজন মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক। ফলে নজরুল কবিতাটির আপত্তিকর চারটি চরণ সংশোধন করে পরবর্তীকালে *চিত্তনামা* গ্রন্থে প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি চিত্তরঞ্জন-নজরুলের সম্পর্কের গভীরতা এবং প্রয়াত চিত্তরঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে নজরুলের কবিতা রচনার অজানা দিক উন্মোচনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি কৌতূহলসঞ্চারী সন্দর্ভ।

বাঙালির কাছে অতিপরিচিত দুটি নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০–১৯২৫) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)। সাহিত্য ও রাজনীতি দুই শাখাতেই এ দুজন বিচরণ করেছেন। প্রথমজন সাহিত্যচর্চায় ব্রতী ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ছেড়ে, এমন কি অর্থপ্রদায়ী আইন-ব্যবসা ত্যাগ করে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। আর দ্বিতীয়জন রাজনীতিচর্চায় সংযুক্ত হলেও শেষ অবধি সাহিত্য-সঙ্গীতের ভুবনে ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত পরিভ্রমণে। আজ অবশ্য বাঙালির রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম খুব একটা শোনা যায় না, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও নয়। এর কারণ বোধকরি একদা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে যাওয়া, কংগ্রেসি রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে স্বতন্ত্র দল গঠন ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র বসু ইংল্যান্ড থেকে লেখাপড়া ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই। কলকাতায় এসে সুভাষ বসু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশ মতো রাজনৈতিক কাজ

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা মিউনিসিপালিটিতে 'মেয়র' নির্বাচিত হলে ডেপুটি হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন সুভাষ বসুকে। আজ বাংলাদেশে দেশবন্ধুর নামে কোনো স্থাপনা আছে বলে জানা যায় না, রাজনীতিতে তাঁর নামোল্লেখও হয় না। অথচ, তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের (মুন্সিগঞ্জ) তেলিরবাগে। আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে তিনি নেতৃত্ব দেন রাজনৈতিক কর্মসূচির। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও আজ তাঁর নাম নেয়া হয় না বললেই চলে। কংগ্রেস থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'স্বরাজ্য দল' (১৯২৩) গঠন করলেও তাঁর উত্তর-প্রজন্ম কংগ্রেস রাজনীতিতেই অবস্থান করেন। তাঁর দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মে যুক্ত থাকলেও স্বরাজ্য দলের নেতা হিসেবেই চিত্তরঞ্জন দাশ চিহ্নিত। টানা চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্টের শাসনামলে কংগ্রেসিরাই যেখানে আলোচনার পাদপ্রদীপের বাইরে ছিলেন, সেখানে চিত্তরঞ্জন দাশের স্থান কোথায়? অথচ, এই মানুষটির কর্ম ও প্রভাব বাংলার রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে অস্বীকার করা যাবে না। যিনি দেশসেবার জন্য সে সময়ের কয়েক সহস্র টাকার আইন-ব্যবসা ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি, যিনি বিপ্লবীদের পক্ষে নিজের টাকা ব্যয় করে আইনি লড়াই করেছেন, যিনি 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট'-এর উদ্গাতা হিসেবে দুই ধর্মের বিরোধকে সামলাতে চেয়েছেন; যিনি নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে গেছেন জনস্বার্থে– তাঁকে আজ আমরা মনে না রাখলেও বা যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলেও মহাকালের পৃষ্ঠায় তাঁর কর্ম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। এই মানুষটির সাহচর্য পেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী নিজেও রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বামীর যোগ্য সহচরী ছিলেন। তিনি পরিণত হয়েছিলেন 'নজরুল-মাতা'য়। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যজ্ঞাপক নজরুলকাব্য *চিত্তনামা* (১৯২৫) উৎসর্গ করার সময় তাই নজরুল বাসন্তী দেবীকে 'মাতা' সম্বোধন করে লেখেন: 'মাতা বাসন্তী দেবী শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে– নজরুল ইসলাম'(কাদির, ১৯৯৩ : ২১১)। চিত্তরঞ্জন-পরিবার আর নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বহুদিন অবধি অব্যাহত ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয় কবে এবং কীভাবে হয়েছিল তার দিনক্ষণ এখন আর জানা যায় না। নজরুলজীবনীকারদের মতে : '১৯২৩-২৪ থেকেই গান্ধি-চিত্তরঞ্জনের মতো সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর [নজরুলে] পরিচয় হয়।' (অরুণ, ২০০০ : ১৭৯)

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর গ্রেফতার হন। চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত পত্রিকা *বাঙ্গলার কথা*র সম্পাদকতার ভার তখন গ্রহণ করেন চিত্তজায়া বাসন্তী দেবী। নজরুলের কক্ষ-সহচর ও কমিউনিস্টনেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে জানাচ্ছেন: এ সময় এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নজরুলের কাছে লেখা চেয়ে দেবর সম্পর্কিত সুকুমাররঞ্জন দাশকে পাঠান বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবীর অনুরোধে 'ভাঙার গান' কবিতা নজরুল তাঁদের সম্মুখে বসেই লেখেন। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> "১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গিরেফ্তার হয়ে জেলে গেলেন। তারপরে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকা হলেন। এই সময়ে তিনি একদিন দাশ পরিবারের তাঁর দেবর সম্পর্কিত শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশকে 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপানোর উদ্দেশ্যে একটি কবিতার জন্যে নজরুল ইসলামের নিকটে পাঠালেন। [...] শ্রীসুকুমাররঞ্জন কবিতার জন্যে ৩/৪-সি, তালতলা লেনে নজরুল আর আমার বাসায় এসেছিলেন, না, এসেছিলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, তা আমি এখন ভুলে গেছি। মোটের ওপরে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই নজরুল লেখা শুরু করে দিল। সুকুমাররঞ্জন আর আমি খুব আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে কবিতাটি লেখা শেষ করে নজরুল তা আমাদের পড়ে শোনাল। সুকুমাররঞ্জন খুবই খুশী হলেন। এই কবিতাটি ছিল নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান'।"[১] (মুজফ্ফর, ১৯৭৫ : ৮৪)

'কারার ঐ লৌহ-কবাট / ভেঙে ফেল, কররে লোপাট / রক্তজমাট / শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী।' –দীর্ঘ কবিতা; এর চেয়েও বড় কথা বিদ্রোহাত্মক গান হিসেবে এখন এর সমাদর বৈষম্যাক্রান্ত যে-কোনো পরিস্থিতিতে– যেটি লেখা হয়েছিল মূলত কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাশকে মনে করেই। ব্রিটিশ সরকার এই গান বাজেয়াপ্ত করে। কাজী নজরুলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঠিক কবে তা মুজফ্ফর আহ্মদও জানাতে পারেন না। তবে এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রটি তিনি জানিয়েছেন এভাবে :

> 'শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর বাড়ীতে নজরুল্ ইস্লাম একদিন খেতে গিয়েছিল এবং তাঁর অশেষ স্নেহ অর্জন করে ফিরেছিল। নজরুলকে দেখিয়ে তিনি ব্যারিস্টার মিস্টার নিশীথচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন যে আদালতে অভিযুক্ত হলে মিস্টার সেন যেন তাঁর এই ছেলেটির মামলার তদবীর করেন। চিত্তরঞ্জন জেল হতে ফেরার পর নজরুল তাঁরও স্নেহধন্য হয়েছিলেন।' (মুজফ্ফর, ১৯৭৫ : ৮৫)

বলা যায়, ১৯২১ সাল থেকেই দেশবন্ধু-পরিবারের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা। ১৯২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি দেশবন্ধুর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং এরপর তিনি মুক্তি পান। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় পুলিশ; একে প্রকারান্তরে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন বাংলার লাট লর্ড লিটন। এর প্রতিবাদ করা এবং ফরিদপুরে অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁদের সঙ্গে আসেন কর্মী হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামও। চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার লিখেছেন: 'লর্ড লিটনের এই ধরনের মন্তব্য আমলাতন্ত্রের জঘন্য রূপ জনসাধারণের কাছে আবার উদ্ঘাটিত করে দিল। লর্ড লিটনের কুৎসিত মন্তব্য ও দুষ্কৃতকারী পুলিশকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রতিবাদে টাউন হলে চিত্তরঞ্জন একটি বিরাট জনসভা করলেন। এই জনসভায় এমন জনসমাবেশ হয়েছিল যে হলে স্থান সংকুলান হলো না। ফলে হলের সিঁড়িতে ও

ময়দানেও সমবেত লোকদের নিয়ে ছোটখাটো দুটি প্রতিবাদ-সভা হলো।' (ঋষি দাস, *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন* : ২৩১) নজরুল ইসলাম এ সময় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ছিলেন। মাদারিপুরের শান্তিসেনা বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাসের কারামুক্তি উপলক্ষে নজরুল লিখেছিলেন আটান্ন পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা– 'পূর্ণ-অভিনন্দন'। পূর্ণচন্দ্র দাস সম্পর্কে আজ তথ্যের অপ্রতুলতা বর্তমান। *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* (জুন, ২০১১) গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে কোনো ভুক্তি নেই। সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান*-এ (আগস্ট, ২০১৩) অনেকের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা পরিচিতি থাকলেও পূর্ণচন্দ্র দাস সেখানে অনুপস্থিত। *বাংলাপিডিয়া* ও *উইকিপিডিয়া*তেও তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। যে পূর্ণচন্দ্র দাসকে নজরুল কবিতায় 'ফরিদপুরের ফরিদ', 'মাদারিপুরের মর্দবীর', 'বাংলা মায়ের বুকের মানিক', 'মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন : 'জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র' (কাদির, ১৯৯৩ : ১৪৪ থেকে ১৪৬)– তাঁর সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য না হওয়া সত্যি দুঃখজনক। ফরিদপুরের সেই সম্মেলনে পূর্ণচন্দ্র দাসও উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা, ফরিদপুরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযাত্রী হলেও নজরুলের সঙ্গে সংশ্রব ঘটেছিল সমকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণের কারণে এই দুই মহাত্মার সংযোগকাল স্থায়ী হয় তিন বছরের মতো। উল্লিখিত অল্প সময়ের মধ্যেই নজরুলচিত্তে দেশবন্ধুর প্রভাব এবং দেশবন্ধুর কর্মে নজরুলের অনিবার্যতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে এ সময় নজরুলও জেলে যান। *ধূমকেতু*তে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লা থেকে তিনি গ্রেফতার হন; ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তাঁর সাজা ঘোষিত হয় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এই সাজা ভোগকালে নজরুল সহবন্দিদের নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অনশন করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলে গেইটে এসেছিলেন নজরুলের সঙ্গে দেখা করে অনশনব্রত ভাঙার কথা বলবেন বলে। তাঁকে জেল কর্তৃপক্ষ দেখা করতে দেয় নি। অনশনের সংবাদ শুনে শিলঙে অবস্থানকারী উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে টেলিগ্রাম করেন: 'Give up hunger strike, our literature claims you'[১]। আর জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৯২৩ সালের ২২শে মে কলকাতা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে গোলদিঘিতে আয়োজিত জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নজরুলের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তব্য দেন। পত্রিকায় সে সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পায়। *অমৃতবাজার পত্রিকায়* ছাপা হয় :

> 'Deshabandhu Chittaranjan Das in declaring the resolution unanimously carried said that he knew the young Kazi very intimately as great poet, fearless and bold, having the courage of his conviction. He had very little hope, when such a youth as Kazi

> Nazrul had gone on hunger-strick that he would ever survive. The young Kazi had given a new life to the Bengali poetry.[২]

দেশবন্ধুর এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামের মতোই নজরুলের বাংলা সাহিত্যজগতে অনিবার্যতা নির্দেশক। চব্বিশ বছরের যুবক নজরুল যে বাংলা কাব্যধারায় নবজীবন দান করেছেন– দেশবন্ধুর এই মন্তব্য যথার্থ। দেশবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে সম্ভাবনা লক্ষ করেছিলেন আগে থেকেই। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমথ চৌধুরীর *সবুজপত্র* পত্রিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী *নারায়ণ* (১৯১৪) পত্রিকায় মাঝে মাঝেই নজরুলের লেখার উদ্ধৃতি দিতেন। তরুণ কাজী নজরুল ইসলামের লেখা তখন *মোস্‌লেম ভারত*-এর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ হচ্ছে। পত্রিকাটির পাঠকসংখ্যা ছিল অতি সীমিত। *নারায়ণ*-এ 'নারায়ণের নিকষ-মণি' নামে একটি বিভাগ ছিল। সে বিভাগে নজরুলের লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে নজরুলকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে এক অর্থে পরিচয়ও করিয়ে দেয়া হয়। বলা চলে, লেখার মাধ্যমেই নজরুল চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং লেখার সূত্রেই বাসন্তী দেবীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ। নজরুলের কীর্তনাঙ্গের একটি গান :

> 'জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
> ভুবলো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙলা দেশের কাশী।
> জাগো বঙ্গবাসী॥
> তোরা হত্যা দিতিস্ যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
> ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপনি আসি।
> জাগো বঙ্গবাসী॥' (কাদির, ১৯৯৩ : ১৪৬-৪৭)

এই গানের শিরোনাম 'মোহন্তের মোহ-অন্তের গান'। এই মোহন্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তারকেশ্বরের মোহন্তদের নানা রকমের পীড়ন ও ধর্মের নামে পাপকর্মের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ গণ-অভিযান পরিচালনা করেন। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল ভালো ফল করার পর জনস্বার্থে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকারী মোহন্তদের বিরুদ্ধে সুভাষ বসু, স্বামী বিশ্বানন্দ প্রমুখের তত্ত্বাবধানে দেশবন্ধু যে গণ-অভিযান পরিচালনা করেন সেই অভিযানে নজরুলও অংশ নেন এবং মোহন্তকে বিদ্রূপ করে 'মোহ অন্ত' লেখেন। তাঁর এই গান সম্পর্কে অরুণ বসু মন্তব্য করেছেন :

> 'সুরে ছন্দে শাণিত অমোঘ বাক্যবন্ধে সে গান আন্দোলনকে দিল সানন্দ গতি ও নান্দনিক উদ্দীপনা, ঠিক যেমন হয় রাজনৈতিক আন্দোলনে, স্বাধীনতা-আন্দোলনে, দেশাত্মবোধক সংগীতের ক্ষেত্রে। সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সমাজশত্রুকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে ও শ্রেণিশত্রুকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করার পরিণতবুদ্ধিতে নজরুলের এই গানটির ভূমিকা ছিল অসামান্য। ধর্মের নামে প্রশ্রয়প্রাপ্ত অনাচারকে উন্মোচিত করার আবেদন নজরুল-রচিত এই সংগীতটির প্রতি চরণে নৃত্যভঙ্গিময় রূপ পেয়েছে।' (অরুণ, ২০০০ : ১৩৫)

উদ্দীপনা চিত্তরঞ্জনের, মোহন্তবিরোধী গণ-অভিযান-রচনা নজরুলের স্বভঙ্গিমার। নজরুল ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে তাঁর বিদ্রোহাত্মক কিন্তু বাজেয়াপ্ত কবিতাগ্রন্থসমূহ, যেমন *বিষের বাঁশি*, *ভাঙার গান* গোপনে বিক্রি হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর রাজনৈতিক কর্মে নজরুলকে সুভাষ বসুর মতোই আস্থার সঙ্গে নির্ভর করতেন। কিন্তু অতি পরিশ্রম করার কারণে চিত্তরঞ্জন দাশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকের পরামর্শে হাওয়া-বদলের জন্য তিনি দার্জিলিঙে গমন করেন এবং সেখানে, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন; ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ়; মঙ্গলবার তাঁর অকাল দেহাবসান ঘটে। দার্জিলিঙে মৃত্যু হলেও, দেশবন্ধুর এই অকাল প্রয়াণের সংবাদ রাতের মধ্যে খুবই দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] নজরুল তখন কলকাতায় বাস করতেন না, বাস করতেন হুগলিতে। তিনি কখন ও কিভাবে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ লাভ করেন, তা আজ আর জানা যায় না। তবে ৩রা আষাঢ় শোকবিহ্বল নজরুল রচনা করেন 'অর্ঘ্য' নামের এই কবিতা :

'হায়, চির-ভোলা হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া।
কেন এত ভালবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি,
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি।
ধরা আর তোমা ধরিতে পারে না,
আজ তুমি দেবতার,
নিয়া যাও দেব মরু-হুগলীর
অর্ঘ্য নয়নাসার।'

(মাসিক *বসুমতী*, আষাঢ় ১৩৩২, ৪০৩)

কবিতাটি প্রকাশ হয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত মাসিক *বসুমতী* পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩২)। সম্পূর্ণ পত্রিকার ফটোকপি বর্তমান প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। কবিতাটি 'অর্ঘ্য' নামেই বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *নজরুল-রচনাবলী*র প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত আছে। কিন্তু তা বারো নয়, আট পঙ্‌ক্তির। *চিত্তনামা* গ্রন্থেও আছে প্রথম আট পঙ্‌ক্তিই। অর্থাৎ,

'ধরা আর তোমা ধরিতে পারে না,
আজ তুমি দেবতার,
নিয়া যাও দেব মরু-হুগলীর
অর্ঘ্য নয়নাসার।'

(মাসিক *বসুমতী*, আষাঢ় ১৩৩২, ৪০৩)

–এই চারটি পঙ্‌ক্তি আজ অবধি গ্রন্থাকারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ঐ চার পঙ্‌ক্তি নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের আগে কোথাও কোনো উল্লেখ আছে বলে জানা যায় না, এমনকি বাংলা একাডেমি বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত রচনাবলির পরিশিষ্টেও এ নিয়ে আলোচনা বা মন্তব্য নেই। অতএব, বলা যায়, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা জাতির কাছে নজরুল-রচিত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এবং প্রায় হারিয়ে যাওয়া অগ্রন্থিত চারটি পঙ্‌ক্তিসহ বারো পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট পুরো কবিতাটি উপস্থাপন করলাম। লক্ষণীয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এবং প্রায় হারিয়ে যাওয়া অগ্রন্থিত এই চারটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই কবিতার শিরোনামের 'অর্ঘ্য' শব্দটি রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণ-সংবাদ শোনার সময় নজরুল যে হুগলিতে ছিলেন– ঐ চারটি পঙ্‌ক্তিতে সে তথ্যের খোঁজ মেলে। এই কবিতায় নজরুল চিত্তরঞ্জনকে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, তিনি মর্ত্যভূমির মানবসন্তানের জন্য অমৃত আনতে গিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে ফিরে এলেন। চিত্তরঞ্জন দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন এবং সেই দার্জিলিঙকে নজরুল হিমালয়ের কাছাকাছি কল্পনা করেছেন। সব মিলিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশকে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে তুলনাটি চমৎকার। কিন্তু এ সবই ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল প্রয়াণের কারণে শোকাতুর নজরুল পর পর পাঁচটি কবিতা ও গান লেখেন এবং সেগুলো সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এগুলো হচ্ছে: 'অর্ঘ্য', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'সান্ত্বনা', 'ইন্দ্র-পতন', 'রাজ-ভিখেরি'। 'অকাল সন্ধ্যা' নামে একটি গান প্রকাশিত হয় *বঙ্গবাণী*র শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়। তার নিচে লেখা ছিল: 'স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোক-যাত্রার গান।' (*বঙ্গবাণী*, শ্রাবণ ১৩৩১ : ৭৬৬) কবিতাটির নবম পঙ্‌ক্তিতে পত্রিকা ও গ্রন্থের পাঠে খুবই ছোট একটু পাঠভেদ আছে।[৪] কবিতায় চিত্তরঞ্জনকে দধীচি মুনির সঙ্গে তুলনা করেছেন নজরুল। আবার শ্মশানে শঙ্করের নৃত্যের কথাও বলেছেন। কীর্তনাঙ্গের হলেও এখানে শ্মশান বা শিবের আগমন ঘটানোতে নজরুলের সর্বগামীচিন্তাই প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে অকালে সন্ধ্যার কালিমা নেমে এসেছে বলে নজরুল মনে করেন। হুগলি ও চুঁচুড়ার পথে অনুষ্ঠিত শোকমিছিলে নজরুল স্বকণ্ঠে এই গান পরিবেশন করেন। দেশবন্ধুকে নজরুল এতো শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁকে তুলনা বা তাঁর চরিত্রের বন্দনা করার সময় নজরুল যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বা ব্যক্তিকে সামনে আনতে দ্বিধা করতেন না। সে কারণে শিব, দধীচি ইত্যাদির মতো মোহাম্মদের কথাও নজরুল তুলনায় এনেছেন। তাঁর রচিত 'ইন্দ্র-পতন' একটি দীর্ঘ কবিতা। বোঝাই যাচ্ছে, চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুকে এখানে ইন্দ্রের পতনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই কবিতায় পৌরাণিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময়। একই সঙ্গে নজরুল লিখেছিলেন :

> 'জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে, হে পুরুষবর
> কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা, হতে পয়গাম্বর।

যে জ্যোতি পারেনি সহিতে স্বয়ং মুসা-ও কোহ-ই-তুরে;
সেই জ্যোতিঃ তুমি রেখেছিলে তব নয়ন-মণিতে পুরে'।' (কাদির, ১৯৯৩ : ৯০৩)

তাছাড়া তিনি লিখেছিলেন: 'হে মানব-আম্বিয়া'। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠীর কয়েকজনের আপত্তির কারণে ওপরের পঙ্‌ক্তি চারটি কবিতা থেকে বিবর্জিত হয়; 'হে মানব-আম্বিয়া'র বদলে আসে 'হে মানব নবী-হিয়া'। চৌধুরী শামসুর রহমানের *পঁচিশ বছর* নামের গ্রন্থের উল্লেখ করে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত রচনাবলির পরিশিষ্টে লেখা হয়েছে:

> ''ইন্দ্রপতন' সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়ই ছাপা হয়েছিল। ... কবি তাঁর এ কবিতায় মহান নেতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে তাঁকে নবীদের সাথে তুলনা করে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলে ফেলেছিল: 'হে মানব আম্বিয়া।' তা ছাড়া কবিতাটিতে এমন আরো কতগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ইসলামী ভাবধারার অনুকূল নয়। এসব ত্রুটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে খোলা চিঠির আকারে লেখা আমার প্রবন্ধ মফঃস্বলের কাগজ 'বগুড়ার কথা'য় দীর্ঘ দুপৃষ্ঠা স্থান নিয়ে প্রকাশিত হয়। আমার এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে তৎকালে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ... পরে যখন কবিতাটি তাঁর 'চিত্তনামা' বইয়ে প্রকাশিত হয়, কবি নজরুল তখন আপত্তিকর লাইনগুলি সংশোধন করে এবং কোনো কোনো লাইন বাদ দিয়েই তা ছেপেছিলেন।'' (কাদির, ১৯৯৩ : ৯০৩)

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পর্কে কত উচ্চধারণা পোষণ করতেন নজরুল। রক্ষণশীলদের সমালোচনার কারণেই যদি নজরুল তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ প্রত্যাহার করে নিয়ে থাকেন, তবে সেটা বাহ্যিক– অন্তরের বক্তব্যটি যথাযথই আছে। আসলে কাজী নজরুল ইসলাম যখন সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন (১৯১৯), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *নারায়ণ* পত্রিকা তখন পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করছে। তরুণ নজরুল সে সময় লিখেছেন মূলত *মোস্‌লেম ভারত* পত্রিকাতেই। লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত *নারায়ণ* তখনই *মোস্‌লেম ভারত* পত্রিকা থেকে তাদের সংকলন বিভাগে (বিভাগটির নাম ছিল : 'নারায়ণের নিকষ-মণি') নজরুলের বেশ কয়েকটি লেখা মুদ্রণ করে। এটি নজরুলের জন্য সম্মান ও স্বীকৃতির ব্যাপার ছিল। সংকলিত লেখা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই নজরুল *নারায়ণ*-এর নিয়মিত লেখক হিসেবে গণ্য হন। চিত্তরঞ্জন দাশ নজরুলের বেশ কিছু লেখা *নারায়ণ* পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। *নারায়ণ* পত্রিকায় *মোস্‌লেম ভারত* সম্পর্কে আলোচনা ছিল। দেখা যায়, এর সিংহভাগই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিষয়ক। *নারায়ণ*-এ নজরুলের কবিতা 'খেয়া-পারের তরণী' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। আর 'বাদল-বরিষণে' গল্পের আখ্যান ও গাঁথুনি সম্পর্কে গল্পের আলোচনাসূত্রে বলা হয়েছে: "তারপর মিলনের আশা পেয়ে নিজে কুৎসিত বলে তার কান্না! সে বড় অপূর্ব জিনিস! 'ময় কারী কাজরীয়া হুঁ– ওগো সুন্দর, আমি কালো।' রূপহীনার এই বেদনা বড় সুন্দর বেজেছে। এমন

আকুল প্রণয়ে মিলন কদাচিৎ হয়, কারণ এত প্রেম যে নিজেই নিবিড়তম মিলন, নিজেই নিজের সার্থকতা। তাই –'সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্তে– শ্রাবণ প্রাতে ধানের মাঝে বসে গাইছি,– আমার নয়ন ভুলানো এলে। তাই এ কাজরী প্রণয়ের পরিণাম হলো– 'বাদল ভেজা তারই স্মৃতি'।" (*নারায়ণ*, কার্তিক ১৩২৭ : ২৩২) 'নারায়ণের নিকষ-মণি' কলামে নজরুল ইসলামের *ব্যথার দান* গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এতে কবিকে 'লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করা হয় যে, যাঁরা সৈনিক কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ, তাঁরা যেন এই বই (*ব্যথার দান*) পাঠ করে দেখেন। নজরুলের গদ্য যথেষ্ট মনমাতান বলেও অভিহিত করা হয়। গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে পত্রিকার উচ্ছ্বাস ব্যাপক: 'এ বই খানা ছটি গল্পের সমষ্টি, শুধু গল্প না বলে কাব্যগল্প বললেই ঠিক বলা হবে। কারণ এ গল্পগুলির মধ্যে কাব্যের মত মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে বই খানা পড়বার পর পাঠকের মনে একটা আবেশময় ঝঙ্কার রেখে যায়।' (*নারায়ণ*, আষাঢ় ১৩৩২ : ৩৩৩) শুধু তাই নয়, এর পরিশেষ-মন্তব্যও বেশ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়: 'বইখানা যিনিই পড়বেন, তিনি এর লেখবার ভঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেন না। সমালোচনা করে এর মাধুর্য্য বোঝান যায় না সুতরাং দেড়টাকা [গ্রন্থটির মূল্য] খরচ করে নিজেকে পড়তেই হবে।' (*নারায়ণ*, আষাঢ় ১৩৩২ : ৩৩৩) লেখালেখির সূচনাকাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম যে রাজনীতি ও সাহিত্যবোদ্ধাদের সমীহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের *নারায়ণ*-এর মতো প্রথম শ্রেণির সাময়িকীতে এ-জাতীয় মন্তব্য-প্রকাশ সে প্রমাণই বহন করে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি; মহাত্মা। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণে উষ্ণ। তাঁরা মাত্র তিন-সাড়ে তিন বছর লাভ করেছেন পরস্পরের সান্নিধ্য। এই অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে সমীহ করেছেন; প্রভাবিত করেছেন; প্রভাবিত হয়েছেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা; কামনা ছিল বাঙালির জন্য শোষণমুক্ত দেশ গড়ার। দুজনের বয়সে পার্থক্য প্রায় ত্রিশ বছর– কিন্তু প্রত্যাশার কোনো পার্থক্য ছিল না তাঁদের।

তথ্যনির্দেশ

[১] উদ্ধৃত, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (১৯৭৫) : *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ১৬৭

[২] উদ্ধৃত, অরুণকুমার বসু (২০০০)। *নজরুল-জীবনী*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৭৯

[৩] মাসিক *বসুমতী* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৩২: ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় 'স্মৃতি-তর্পণ' লিখতে গিয়ে জনৈক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত লিখেছেন: '১৬ই জুন, ২রা আষাঢ়, মঙ্গলবার, রাত্রি তখন বোধ হয় ৯টা, ঘরে বসিয়া ছিলাম, আত্মীয় একটি যুবক আসিয়া বলিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে।'

[৪] পাঠান্তর: পত্রিকায় আছে: 'কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।' গ্রন্থে আছে: 'কুসুম ফেলে নিল খঞ্জর গো।'

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার বসু (২০০০) । *নজরুল-জীবনী* । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

আবদুল কাদির (সম্পাদক) (১৯৯৩) । *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড নতুন সংস্করণ । বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ঋষি দাস (১৯৮৪) । *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন* । অশোক প্রকাশন, কলকাতা

মুজফ্ফর আহমদ (১৯৭৫) । *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা* । ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা

পত্রিকাপঞ্জি

নারায়ণ । ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৭ । কলকাতা

নারায়ণ । ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩২ । কলকাতা

বঙ্গবাণী । ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩১ । কলকাতা

বসুমতী । ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩২ । কলকাতা